তারা

শ্রীমহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তারা।

হেয়ার স্কুলের সহকারী শিক্ষক
শ্রীমহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক বিরচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাজিতপুর
মহিমাপ্রচার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীস্মরণানন্দ মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৭।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

গুপ্তপ্রেশ;
শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।
২২১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
সন ১৩১৭ সাল।

ভাগলপুরের জমিদার

অশেষ কল্যাণ ভাজন

শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

মহোদয়ের

ক র-ক ম লে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

সাদরে অর্পিত

হইল।

অবতরণিকা।



তারাদেবীর কৃপায় আমরা বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। প্রথম বারের উদ্যমে যাহা বীজ বলিয়া বিবেচিত ছিল, এই বার তাহা বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহার পুষ্প কেমন মনোহর এবং ফলের আস্বাদ বিস্বাদ কিনা—তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

তারাপুরের ইতিহাস বা বামাচরণের জীবনী বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহার ভ্রম নির্ণয় করিয়া অথবা কোন বিষয় লিখিত হইয়া না থাকিলে তাহা লিখিয়া আমাদিগকে জানাইলে, আমরা ধন্যবাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

এই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমরা অনেকেরই নিকট ঋণী। তন্মধ্যে তুড়িগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজদুর্লভ ঘোষাল মহাশয়ের নাম সমধিক উল্লেখ যোগ্য। ইনি স্বনামধন্য পুরুষ। বামাচরণের ভাগিনেয় হরিধাড়া

নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়ের নিকটেও আমরা ইহার জন্য অপরিশোধ্য ঋণে জড়িত। বামাচরণের পরম ভক্ত বালীনিবাসী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিংহ মহাশয় এবং নলহাটী পাইকপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বল্লভ সিংহ মহাশয়ও ইহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সাধুচরিত্রে যদি কোন দোষ দৃষ্ট হয় তবে তাহা লেখকের অজ্ঞতাবশতঃ ঘটিয়াছে—সাধুর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক জানিবেন এবং তজ্জন্য লেখকের অপরাধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। ইতি। সন ১৩১৭ সাল ২রা মাঘ।

বাজিতপুর
পোঃ—কুণ্ডলা
জেলাঃ—বীরভূম

নিবেদক
শ্রীমহিমা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

তারা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূজার নিয়ম।

তারা দেবীর চরণে শরণ লইয়া, যদি জীবনের ভার লাঘব করিবার কামনা করিয়া থাকেন, অথবা দয়াময়ীর দয়া দেখিয়া যদি বিষয় বাসনার বিনাশ করিতে চান তবে আব বিলম্ব করিবেন না, সত্বর তারাপুরে শুভাগমন করুন। এখানে উত্তরবাহিনী দ্বারকানদীর বিমল সলিলে অবগাহন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করুন, পরে প্রস্ফুটিত পুষ্পে পাণি পরিপূর্ণ করিয়া বলুন ঃ—

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ ॥
নবযৌবন সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং ॥
খড়্গাকত্রী সমাযুক্ত সব্যেতরভুজদ্বয়াং।
কপালোৎপল সংযুক্ত সব্যপাণিযুগান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যোভূষিতাম্ ॥
জ্বলচ্চিতাং মধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশস্মের বদনাং স্ত্র্যলঙ্কার বিভূষিতাম্ ॥

বিশ্বব্যাপক তোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
অক্ষোভ্যো দেবী মূর্দ্ধণ্য স্ত্রীমূর্ত্তির্নাগরূপধৃক্ ॥

এবং ভক্তির সহিত দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করুন। মন্দির প্রদক্ষিণের পর চন্দ্রচূড় ভৈরবের অর্চ্চনা করিবেন। দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা শেষ হইলে দেবীর পুষ্পোদক ও জীবিত কুণ্ডের জল পান করা কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলিয়া জানিবেন। তার পর মহর্ষি বশিষ্ঠের যোগাসন দর্শন করিয়া প্রধান প্রধান কৌলিক ও সাধ্যমত সাধুগণের সেবা করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বামাচরণ এক্ষণে প্রধান কৌলিকের পদে বিরাজ করিতেছেন। ইনিই আমাদের সেই "বামা ক্ষেপা"।

যাঁহারা সাধক তাঁহারা এই পীঠে বসিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—এখানে জপ করিলেই সিদ্ধি-লাভ ঘটিয়া থাকে। শক্তিমন্ত্রের উপাসকেরা বলেন—

তারাপুর মিদং পীঠং গন্তব্যং যত্নতঃসদা।
লক্ষত্রয়জপাদ্দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা ভবেৎ ॥

অর্থাৎ সকলেরই যত্নপূর্ব্বক তারাপীঠে গমন করা উচিত। এখানে তিনলক্ষবার জপ করিলে দেবী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

তারাদেবীর নিত্যপূজা ও বিশেষপূজার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা প্রাতস্মরণীয়া রাণী ভবানীর সময় হইতে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং পূজার

যাবতীয় ব্যয়ভারও তদবধি তাঁহার বংশধরগণ বহন করিয়া আসিতেছেন।

পঞ্চপর্ব্বের প্রতিপর্ব্বে, প্রত্যেক শনিবারেও মঙ্গলবারে, নিত্যপূজার পর দেবীর বিশেষপূজা হইয়া থাকে। বিশেষপূজার সময় ছাগবলির ব্যবস্থা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুর্গাপূজার সময় ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ সহ কয়েকদিবস রীতিমত পূজা হইয়া থাকে। মহানবমী পূজায় এখনও মহিষবলি হইয়া থাকে। এইরূপ দীপান্বিতায় ও জগদ্ধাত্রীপূজায়, এবং রটন্তী ও বাসন্তী-দেবীর অর্চ্চনার সময়ে তারাদেবীর পূজা যথারীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। বারুণীর দিবসেও এখানে বিশেষপূজার ব্যবস্থা আছে। বারুণীযোগে দ্বারকায় স্নান করিবার জন্য এখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। রথযাত্রার সময়, জন্মাষ্টমীর উৎসবে ও দোললীলায় যে উৎসব হয় তাহাতে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ সমভাবে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ একস্থানে শাক্তগণের যাবতীয় পর্ব্বের পূজা ও বৈষ্ণবগণের মহোৎসব এরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে দেবীর মহাপূজা হইয়া থাকে। এই পূজায় বহুদেশ হইতে বহু লোক আগমন করেন। এই উপলক্ষে যে মেলা হয় তাহা দর্শনের অযোগ্য নহে।

চতুর্দ্দশীর এই পূজায় অসংখ্য ছাগ বলিরূপে প্রদত্ত হয়। এই বলিদানের ব্যাপার বহুক্ষণ ধরিয়া সমভাবে চলিতে থাকে। ইহার প্রারম্ভে একসঙ্গে চারিস্থানে চারিটী বলি দেওয়া হয় ও ঠিক সেই সময়ে নদীর অপর পারে আর একটী বলি দেওয়া হইয়া থাকে। যে পাঁচটী বলির কথা লিখিত হইল তাহারা এড়োলের জমিদার, জেমো ও বাগডাঙ্গার রাজগণ, শাহপুরের জমিদার ও মলুটীর জমিদারগণের প্রদত্ত। এই কয়েকটীর পরের বলি রাণী ভবানীর প্রদত্ত। ইহার পরে যে সকল প্রদত্ত হয় তাহাদের মধ্যে অগ্র বা পশ্চাৎ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই।

এখানেও পাণ্ডা আছে। বিদেশীয়গণের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগকে এখানকার কর্ত্তব্য সাধনে সাহায্য করাই ইঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত আশুতোষপাণ্ডা মূল বা প্রধান পাণ্ডা বলিয়া পরিচিত।

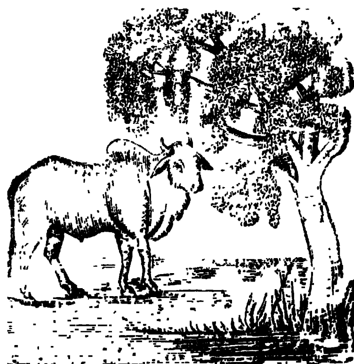
কিরূপে এই পূজার প্রচার হইল এবং কোন্ কোন্ মহাত্মার সুব্যবস্থায় বর্ত্তমানের ন্যায় পূজার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তৎসমুদয় যথাক্রমে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ সমূহে লিখিত হইয়াছে।

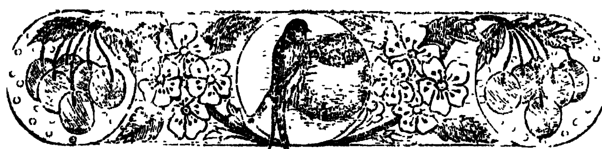
যেখানে তারাদেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার নাম চণ্ডীপুর। তারাপুর গ্রাম ইহার এক মাইল দক্ষিণে

অবস্থিত। লোকে ইহাকে তারাপুর বলিয়াই জানে। এই স্থানে আসিতে হইলে ই, আই, রেলওয়ের লুপলাইন শাখার অন্তর্গত মল্লারপুর ষ্টেসন্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলিতে হয়। রামপুর-হাট ষ্টেসনেরও প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

তারাপীঠ মহাপীঠ নহে। ইহা একটি সিদ্ধপীঠ। মহর্ষি বশিষ্ঠ এইস্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া তারাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন সেই জন্য লোকে এখনও বলে

"তারাপীঠে ভবদারা
বশিষ্ঠারাধিতা তারা ॥"





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরাণ কাহিনী।

(১)

এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইলে সহসা কোন কারণে ব্রহ্মার ধ্যানে বিঘ্ন জন্মিল। তিনি তখন নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং দেখিলেন--সুনীল সমুদ্রের বক্ষে নব নির্ম্মিতা পৃথ্বী পরম রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছে, চারুতায় কেশবের বক্ষ বিরাজিত কৌস্তভের শোভাকে পরাজিত করিয়াছে। অপার সাগর সেইজন্য উল্লাসের তরঙ্গ তুলিয়া এই পৃথিবীর চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতেছে ও আহ্লাদে যেন আটখানা হইয়া পড়িতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিসুখকর কল কল স্বরে পরমেশ্বরের গুণ-গানেও রত রহিয়াছে।

প্রজাপতি পৃথিবীর এই প্রকারের শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। অভিনব ভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য তাঁহার মনে বাসনা জন্মিল, তাই তিনিও তৎক্ষণাৎ পৃথিবী পরিদর্শনে প্রস্থান করিলেন।

স্বয়ম্ভূ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতেছেন—সমতল ভূমি নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ, সেখানে স্বচ্ছসলিলা নদীর প্রবাহ রহিয়াছে; কোন কোন স্থানে নির্ঝর নিচয় হইতে অবিরলধারে বিমল জল বহির্গত হইতেছে; কোন কোন প্রদেশ অশেষ প্রকার তরুলতায় সতত সমাচ্ছন্ন—ময়ূর সেখানে উন্মুক্ত পুচ্ছে নৃত্য করিতেছে; সেখানে যে সকল তরুবর বিদ্যমান, তাহারা ফুলের ভারে ও ফলের ভরে অবিরত অবনত রহিয়াছে, কোকিল আবার কুহু রবের তান তুলিয়া সেই স্থান সতত নিনাদিত রাখিতেছে; বিবিধ বিচিত্র পশুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেইস্থানকে সুখময় করিয়া তুলিতেছে। প্রজাপতি এই সকল অবলোকন করিয়া ভাবিলেন—এখানে সুখের সীমা নাই।

এখানে সুখের সীমা নাই—সত্য, কিন্তু এই সুখ ভোগ করিবে কে? এই প্রকার সুখের প্রকৃত অধিকারী কে? যে সকল জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারাই কি এই সুখ ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র? এই সকল চিন্তা করিয়া প্রজাপতি স্থির করিলেন—কোন শ্রেষ্ঠতম জীবের সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহারা বিবেকবিশিষ্ট হইবে ও তাহাদের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার শক্তি থাকিবে। ব্রহ্মার মনে এই সঙ্কল্প জন্মিবা মাত্রই দক্ষাদি প্রজাপতিগণ ও নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সৃষ্ট হইলেন। ইঁহারাই ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল মানস

পুত্রগণের মধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠও ছিলেন। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন।

"বশিষ্ঠ জনম লভে বিধি-রসনায়।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মখণ্ড।

মানস পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যানেই নিমগ্ন রহিলেন। সংসারের শোভায় তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হইল না। পৃথিবীর বস্তু সমূহ লোভনীয় হইলেও তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহারাও নির্ব্বিঘ্নে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। পৃথিবীর নির্জ্জনতা সেইজন্য পূর্ব্বে ও যেমন ছিল এখনও সেইরূপ রহিল।

ব্রহ্মা ভাবিতেছেন—মানবগণের সৃষ্টি হইল, পৃথিবী তথাপি লোকে লোকারণ্য হইল না কেন? পৃথিবী এখনও জনকোলাহলে মুখরিত হইতেছেনা কেন? তবে কি পুত্রগণ পুত্রোৎপত্তির জন্য বিবাহ করে নাই? প্রজাপতি তখন একে একে পুত্রগণকে ডাকিলেন ও তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে বলিলেন। এইস্থলে শাস্ত্রকার লিখিয়াছেনঃ—

"পুত্রগণে বিরিঞ্চি ডাকিয়া বলে তবে।
পুত্রহেতু কামিনী বিবাহ কর সবে॥
পুত্র জন্মাইয়া সৃষ্টি করহ সৃজন।
বংশবৃদ্ধি হেতু মোর তুষ্ট হয় মন॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্ম খণ্ড।

এই পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে লিখিত রহিয়াছে :—

"পুনশ্চ সাতটী জন্মে মানস তনয়।
সপ্তর্ষি যাদের নাম আছে পরিচয়॥
সৃষ্টি হেতু সাতজনে দেব পদ্মাসন।
মধুর বচনে পরে করে নিয়োজন॥"

পুত্রগণ পিতার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন—বিবাহ করিলে আমরা ঈশ্বর-চিন্তার সময় পাইব না, কামিনী হইলেই মন কাঞ্চন লাভের জন্য লালায়িত হইবে এবং আমরাও তখন বিষয়-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া বিবেকের শাসনে চলিতে পারিবনা, সুতরাং অবনতির পথে ক্রমেই অগ্রসর হইব; পিতঃ আপনি আমাদিগকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিবেন না; বিবাহই সকল কষ্টের মূল।

প্রজাপতি পুত্রগণের উত্তর শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি উত্তরের সারবত্তাও বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কি করিবেন? তিনি যে বাসনার বশীভূত! যে একবার বাসনার অনল দেখিয়াছে চিরকালের জন্য তাহার জ্ঞান চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি পুত্রগণকে একে একে ডাকিলেন ও বিবাহ করিতে বলিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

প্রজাপতি ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্রগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, পুত্রগণের মধ্যে দক্ষই তাঁহার প্রথমলক্ষ্য।

তিনি দক্ষকে বলিলেন—তুই যেমন পিতার হৃদয়ে কষ্ট দিয়াছিস্ তুই তেমনি জামাতার নিকট অপমানিত হইবি। মহাদেবের নিকট অপমানিত হইয়া এই দক্ষ যে যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সতী তাহাতেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অপরাপর পুত্রগণের মধ্যে নারদ হরিভক্ত ও বশিষ্ঠ সংযমী। স্বয়ম্ভূ তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বলিলেন—

"পিতৃবাক্যে অবহেলা করিলি যেমন।
দাসীগর্ভে জন্মতোর হবে সে কারণ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোবেদনায় অধীর হইলেন, কিন্তু কি করিবেন—আর উপায় নাই। পিতৃবাক্যে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার যে পাপ জন্মিয়াছে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। অবশেষে তিনি মন স্থির করিয়া তপস্যায় বসিলেন।

কত শত বৎসর অতীত হইয়া গেল, কত যুগ অতীত হইয়াছে, পৃথিবীতে কত বিপ্লব ঘটিল, বশিষ্ঠদেব তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না—কারণ তিনি তখনও ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। অনাহারে, অনিদ্রায়, বর্ষার বর্ষায়, শীতের বাতাসে ও গ্রীষ্মের উত্তাপে তাঁহার শরীর ক্ষীণ হয় নাই বা পুষ্টি লাভ করে নাই, যে প্রকার ছিল, সেই প্রকারই আছে—শরীর যেন পাষাণে গঠিত। পাষাণেরও

কালে ক্ষয় হয় কিন্তু এই শরীরের ক্ষয় নাই ইহা অটল, অচল ও অক্ষয়।

সকল কাজেরই একটা সময় আছে। সূর্য্য অসময়ে উদিত হয় না, অকালে ফুল ফুটেনা বা ফল পাকেনা। সময়ে সকলই জন্মে ও সময়ে সকলই লয় প্রাপ্ত হয়। অসময় বলিয়া সময় এতদিন বশিষ্ঠের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এক্ষণে তাঁহার প্রতিফল পাইবার সময় উপস্থিত। বশিষ্ঠও সেইজন্য তপস্যা ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

বহু দেশ, বহু জনপদ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি চীন দেশে উপনীত হইলেন। চীন দেশের যে অংশে তিনি উপস্থিত হইলেন, সেখানে তখন তারা দেবীর পূজা হইতেছিল—পূজার উপকরণ মদ্য আর মাংস। বশিষ্ঠকে আসিতে দেখিয়া তাহারা পূজার উপকরণাদি লুকাইয়া রাখিল।

বশিষ্ঠ দেব তৎসমস্তই দেখিলেন ও তাহাদের অভি-প্রায়ও বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ইহারা ঘোর অনাচারী, মদ্য বা মাংস দিয়া কি কখন দেব দেবীর পূজা করিতে হয়? ইহাদের জপ, তপ বা পূজা যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই তামসিক। চীন দেশের অধিবাসিগণ বশিষ্ঠের অন্তরের কথা বুঝিতে পারিল এবং বলিল—বশিষ্ঠ তুমি যে কত বড় জিতেন্দ্রিয়

তাহা আমাদের বুঝিতে বাকী নাই ? বল দেখি প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় কে ? যে প্রলোভনের মাঝে থাকিয়াও স্থির থাকিতে পারে - সে জিতেন্দ্রিয়—না যে প্রলোভনের ভয়ে পিতার বাক্যে অবহেলা করিয়া বিবাহ করিতে চায় না—সেই জিতেন্দ্রিয় ? তুমি যেমন আমাদের রীতি-নীতির ঘৃণা করিলে তেমনি তুমি জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া এই ভাবে পূজা না করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না; যাও জন্মান্তর গ্রহণ কর, তোমার পিতার কথা সফল হউক।

বশিষ্ঠ দেব তাহাদের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং সত্বরে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিছু দূর আসিয়া তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থে উপস্থিত হইলেন ও এই স্থানে অনশনে থাকিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

(২)

দ্বারকানদীর তীরে কবিনন্দ নামে বন ছিল। মুনিবর কুবুদ্ধ সেই বনে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে তপোবনে পরিণত করিয়াছিলেন। কুবুদ্ধ চিরকুমার। তিনি সাধারণের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতেন। পরোপকার করা ও পরের ক্লেশ নিবারণ করা তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম ছিল। এইজন্য এই প্রদেশের কি বালক, কি বালিকা, কি যুবক, কি যুবতী সকলেই তাঁহাকে দেখি-

বার জন্য আসিতেন ও তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিতেন।

নদীর যে তীরে কুবুদ্ধের তপোবন, তাহার পর পারে চন্দ্রচূড় নামে অনাদি লিঙ্গ শিব বিদ্যমান। এই শিবের প্রসাদে জন্মিয়াছে বলিয়া এখানকার রাজার নাম চন্দ্রচূড় হইয়াছে। চন্দ্রচূড় রাজার রাজধানী এই শিবমন্দিরের অনতিদূরে ছিল। রাজা চন্দ্রচূড় ও রাণী তারাবতী মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া শিবের পূজা করিতেন।



হারাবতী ও তারাবতী।

একদিন রাণী তারাবতী সহচরী হারাবতীকে লইয়া শিব দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দ্বারকায় স্নান করিয়া কুবুদ্ধের চরণ বন্দনা করিবেন, পরে মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া গৃহে গমন করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তাঁহারা যখন স্নানের পর তীরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, যতিবর কুবুদ্ধ তখন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। দৈবের ঘটনা অতীব বিচিত্র। তারাবতীর রূপ দেখিয়া বৃদ্ধ কুবুদ্ধের মনে ভাবান্তর জন্মিল। তারাবতী তাঁহার চরণ দর্শন করিবার জন্য আসিলে তিনি আরও উন্মনা হইলেন।

তারাবতী মুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহাবিপদে পতিত হইলেন। একদিকে রমণীর ধর্ম্ম অন্যদিকে মুনির অভিশাপ। রাণী ভাবিতে লাগিলেন—ধর্ম্মহীন হইলে কেবল আমিই নরক ভোগ করিব কিন্তু অভিশাপে আমার বংশ ধ্বংস হইতে পারে, পিতৃকুলে প্রলয় ঘটিতে পারে, সুতরাং আমার ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দেওয়াই ভাল। ভারত চন্দ্রের কোটাল একদিন এই প্রকার বিপদে পড়িয়া বলিয়াছিলেন :—

"না দেখিলে রাজা বধে দেখিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥"

আমরাও তারাবতীর বিপদ দেখিয়া বলিতে পারি—

"নাশুনিলে রাজা যাবে রাজ্য হবে নষ্ট।
শুনিলে সতীত্ব যাবে রাণী পাবে কষ্ট॥"

অনেকক্ষণ চিন্তার পর রাণী বলিলেন—মহাভাগ, সন্ধ্যার সময় বসন ভূষণ পরিয়া আমি আপনার নিকট আসিব, সহচরী আমার সঙ্গে রহিয়াছে, আমি সন্ধ্যার সময়

একাকিনী এখানে আসিব। কুবুদ্ধ বলিলেন—বেস্, যেন আসিও।

রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রাণীর লজ্জার সীমা নাই, দারুণ অনুতাপে মন পুড়িতেছে। হারাবতীকে তিনি বলিলেন—সহচরি এখন কি করি? এমন সময়ে রাজা সেখানে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাণী লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইলেন ও কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ভাবিলেন—আজ হয়ত কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কাল বিলম্ব না করিয়া হারাবতীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হারাবতীও সকল কথাই শুনাইলেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া রাজা নির্ব্বাক্, রাণী মৃতপ্রায়, আর হারাবতী ভাবিতেছেন—হায় কি করিলাম!

হারাবতী ভাবিতে লাগিলেন—আমি আজন্ম ইঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত, আমি কি এসময়ে কোন উপকার করিতে পারিব না? লোকে বলে আমার রূপ আছে, আমার যৌবন আছে, আমার শরীরে এখনও ভুবন-মোহিনী কান্তি রহিয়াছে; আমিই তবে তারাবতী সাজিয়া কামান্ধ কুবুদ্ধের নিকটে যাই না কেন? যদিও হীনবংশে আমার জন্ম হইয়াছে, যদিও দাসী বলিয়া আমাকে সকলেই জানে তথাপি আমার বিশ্বাস কামান্ধ কুবুদ্ধ কখনই আমাকে চিনিতে পারিবে না, আর আমিও তাঁহাকে চিনিবার অবকাশ দিব না; স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রখরা, অন্য

কোন কার্য্যে হউক বা না হউক পুরুষের মন অপহরণ করিতে আমাদের মত পটু কে আছে ?

রাজা ও রাণী তখনও নির্ব্বাক্ তখনও নিস্পন্দ। হারাবতী আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—মহারাজ, আমি থাকিতে আপনাদের চিন্তা কি ? আমিই তারাবতী সাজিয়া মুনির নিকটে যাইব। তিনি আমাকে কখনই চিনিতে পারিবেন না। আপনারা স্থির হউন। সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। আপনারা এখন আমাকে সাজাইয়া দিন্—আর বিলম্ব করিবেন না।

রাজা অনেক আপত্তি করিলেন, রাণী বলিলেন তাহা কখনই হইতে পারে না, হারাবতীর যাওয়া হইবে না। হারাবতীর কথায় শেষে সকলেই বাধ্য হইয়া সম্মতি দান করিলেন। প্রভুর কার্য্য করিতেছেন বলিয়া হারাবতীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, হারাবতী একবার দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের রূপ দেখিতে লাগিল। রূপ দেখিয়া রমণী ভাবিতে লাগিল—আমার জীবনে এ প্রকার সুখ এই প্রথম এবং এই শেষ ; রাণী আমাকে স্বহস্তে সাজাইয়া দিয়াছেন, ইহা হইতে সুখের বিষয় আর কি আছে ?

হারাবতী আর বিলম্ব করিলেন না, রাজাকে প্রণাম করিলেন রাণীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন, ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যা যায় যায় রাণী এখনও আসিতেছে না কেন? কুবুদ্ধ এই চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তপোবনের রমণীয়তা শুক্লাত্রয়োদশী শশীর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া কুবুদ্ধের কষ্ট বর্দ্ধন করিতে লাগিল। শরৎকাল হইলেও দুষ্ট কোকিল কুবুদ্ধের কর্ণে বিষ বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি তখন অধীর হইয়া পড়িলেন।



এমন সময় অদূরে পদশব্দ শ্রুত হইল। কুবুদ্ধ দেখিলেন—রাণী আসিতেছেন। মুনিবর তাঁহাকেই রাণী মনে করিলেন, ও কয়েকমাস পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন। অবশেষে যখন একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল তখন কুবুদ্ধের মনে অনুতাপ প্রবেশ করিল। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কুবুদ্ধ যোগাসনে বসিলেন ও

অচিরে নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

হারাবতীর এই তনয় বশিষ্ঠনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভাবলে ইনি বাল্যকালেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকালেই জননীর অনুমতি লইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

যোগে মগ্ন থাকিতে থাকিতেই তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার তপস্যা তখনও পূর্ব্ববৎ সমান! এই সময়ে তিনি যোগবিঘ্নকর নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে পাইলেন; কখনও দেখিতেছেন— ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রগণ ভীষণ বদন ব্যাদন করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে, কখনও বা নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী সহাস্যে আস্তে তাঁহার মনোহরণের চেষ্টা করিতেছে। বশিষ্ঠদেবের কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি তারা নামের তরবারি লইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার তপোভঙ্গ কি সহজ কথা!

তারাদেবী তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তখনও দেখা দিতে পারিলেন না—দৈববাণীর ছলে বলিলেন— "চীনদেশে তারাপীঠে করহ গমন।"

নবীন তপস্বী তখনই চীনদেশে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া বহুদিনের পরে তিনি তথায় উপনীত হইলেন ও দেখিলেন—সাধকেরা সেখানে মদ্য মাংস দিয়া তারাপূজা করিতেছে। এবারেও

তাঁহার মনে ঘৃণার উদয় হইবার চিহ্ন দেখা দিতেছে, এমন সময়ে তিনি শুনিলেন—

"ঘৃণা করিও না বাছা এরীতি পূজার।
মদ্যস্পর্শ কর সিদ্ধি হইবে তোমার॥"

বশিষ্ঠ সেখানে পূজার প্রকরণ দেখিলেন ও কবিনন্দারণ্যে আসিয়া কোথায় তারাপূজা করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন নদীর পরপারে চন্দ্রচূড়ের নিকট তারাপূজা করিতে হইবে।

নদী পার হইয়া তিনি যে পীঠে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন তাহা সিদ্ধপীঠ বলিয়া অভিহিত। আজিও সেখানে তারাদেবীর ও চন্দ্রচূড়ের অর্চ্চনা হইতেছে।

তৎকালে মিথিলা ও অযোধ্যা ভারতের গৌরব রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং যাবতীয় প্রধান প্রধান লোক তৎকালে হয় মিথিলায় নয় অযোধ্যায় গিয়া বাস করিতেন। বশিষ্ঠদেবও সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ও অযোধ্যার নিকট বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড আজিও বশিষ্ঠকুণ্ড নামে সেখানে বিখ্যাত রহিয়াছে। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন ও বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদ করিয়া স্বগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনিই রাজা রামচন্দ্রের পুরোহিত ছিলেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূজার প্রচার।

বশিষ্ঠের প্রস্থানের পর কতকাল গিয়াছে, কত ঘটনাই ঘটিয়াছে এবং কত যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা বা পরিমাণ করা অসাধ্য; তাহাদের কথা আমরা কোন কাহিনীতেও শুনিতে পাই না, কোন পুরাণেও দেখিতে পাই না এবং ইতিহাসেও তাহাদের বিবরণ পাওয়া অসম্ভব।

এইভাবে বহুকাল গত হইলে, আমরা এইরূপ শুনিতে পাই যে, রমাপতি নামে পরিচিত কোন বণিক্‌ বাণিজ্য করিবার আশায় এই নদী দ্বারকা দিয়া যাতায়াত করিতেন। এই নদীর তীরে অবস্থিত রত্নগড়ে তাঁহার নিবাস। বণিক্‌গণের বসতির জন্য রত্নগড় তৎকালে সামান্য গ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইত না। ইহার বর্ত্তমান নাম রাতগড়া।

রমাপতি তারাপীঠের নিকট দিয়া যাইবার সময় উভয় তীরের শোভা সন্দর্শন করিতেন, তাহাদের শান্তি রসাস্পদ চারুকান্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন এবং প্রত্যেকবারেই মনে করিতেন—ফিরিবার সময় এখানে একদিন থাকিতে হইবে। কিন্তু তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত এই বাসনা চরিতার্থ করিবার অবসর লাভ করিতে পারেন নাই।

দৈবের গতি অতি বিচিত্র। একবার বিপাকে পড়িয়া তিনি সেখানে থাকিতে বাধ্য হইলেন। রমাপতি ভৃত্য-গণকে রন্ধনের আদেশ দিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন। তিনি স্থির করিলেন—আহারের পর সকলে মিলিয়া এখানে কিছুদূর বেড়াইতে যাইব।

স্নান ও তর্পণ সমাধা করিয়া রমাপতি ইষ্টদেবের পূজায় বসিলেন, কিন্তু পূজায় মনোযোগ ঘটিল না; নয়নজলে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইল, পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হইয়া পড়িল—তিনি শোকাবেগে কাতর হইয়া পড়িলেন। এই শোকের কারণ—পুত্র বিয়োগ।

বণিকের পুত্র একটী মাত্র, সেই পুত্রটীও আবার মৃত! রমাপতি পুত্রকে স্বকীয় বৃত্তি শিখাইবার জন্য, জননীর ক্রোড় হইতে শিশুটীকে লইয়া বিদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তখন পত্নীর অনুরোধ বা ক্রন্দনে

কর্ণপাত করেন নাই, বন্ধুবান্ধবের পরামর্শও শুনেন নাই; পুত্রকে ব্যবসা শিক্ষা দিবেন বলিয়া এবার তিনি সপুত্রক বাণিজ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন। সেই পুত্রটী আজ মৃত! এদিকে তিনিও বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, আর কয়েক দণ্ড পরেই গৃহে উপনীত হইবেন। গৃহে গমন করিয়া কি বলিবেন—তাহা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ কাতর, মন বিকল ও নয়ন জলে ভাসমান।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—সাধুবর, একবার এখানে আসুন, অতি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিবেন, আমরা জীবনেও কখন এমন দেখি নাই! মহাজনের শোকাকুল চিত্ত ভৃত্যের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিল কি না বলা দুঃসাধ্য। মহাজন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাহার অনুগমন করিলেন; হাঁ বা না কিছুই বলিলেন না।

তিনি দেখিলেন—পুকুরের জলে মৃত মৎস্য জীবিত হইতেছে। বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে তিনি ভৃত্যকে বলিলেন জননীর সান্ত্বনার জন্য শিশুর মৃতদেহ সযত্নে রক্ষা করিতেছি, একবার সেই দেহটী এখানে আন দেখি, আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা হউক। সাধুর কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই ভৃত্যগণ মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করিল। সাধুর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তিনি ভগ্নস্বরে রুদ্ধকণ্ঠে অপরিস্ফুট কথায় অতি কষ্টে বলিলেন—ভগবন তোমার মহিমা অপার!

রমাপতি সেই পুষ্করিণীর নাম জীবিতকুণ্ড রাখিলেন এবং পুষ্করিণীর তটস্থ জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করিলেন। মন্দিরের মধ্যে অনাদিলিঙ্গ মহাদেব দর্শন করিয়া তিনি আত্মাকে চরিতার্থ মনে করিলেন, এবং মনে করিলেন—এইস্থানে নারায়ণ শিলার প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে গমন করিতে হইবে।

সেই দিন রজনীযোগে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে এক মহর্ষি তাঁহাকে বলিতেছেন—তুমি এখানে তারামূর্ত্তির পূজা প্রচার করিবে, এখানে তারাপূজা হইবে ; আর এই যে মহাদেব রহিয়াছেন ইঁহার লৌকিক নাম চন্দ্রচূড়, ইঁহারও পূজার ব্যবস্থা করিও। রমাপতি স্বপ্নের ঘোরেই বলিলেন—দেব ! আমি যে নারায়ণ পূজার সঙ্কল্প করিয়াছি, তবে কি আমার কামনা পূর্ণ হইবে না ? তৎক্ষণাৎ সেই দিব্যদেহধারী উত্তর করিলেন—এই তারা-মূর্ত্তিতেই নারায়ণেরও পূজা হইবে। রমাপতি এই কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন—এমন সময়ে সেই দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন এবং তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ ঘটিল।

তৎপর দিবস বণিক্ সেখানে অবস্থান করিলেন এবং তারাপূজার প্রচার করিয়া স্বভবনে গমন করিলেন।



তারা।

(২)

তারাদেবীর পূজা, রমাপতির স্থাপনার পর যথারীতি চলিয়া আসিতেছে; তবে কোন্ কোন্ মহাত্মা পূজার জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি বা ইতিহাস যাহা বলিতে পারে তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। এতদ্ব্যতীত জানিবার আর কোন উপায় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে কি হইবে?

রাজসাহীর গৌরব রবি যখন ভাগ্যরূপ নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে বিরাজ করিতেছিল সেই সময়ে বীরভূমের কিয়দংশ তথাকার জমিদার বা রাজা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

এই নববিহিত প্রদেশের বা পরগণার নাম তদবধি রাজসাহী হইয়াছে। ইহা এখনও বিদ্যমান থাকিয়া রাজসাহীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দান করিতেছে। যেখানে তারাদেবীর পূজা হইতেছে তাহা এই পরগণার অধিকদূরে অবস্থিত নহে।

রাজসাহীর অধিপতি, এড়ালের জমিদার রামজীবনের উপর এই পরগণার ভার অর্পণ করেন। রামজীবনের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে অপর কয়েকপরগণারও কর আদায় করিবার ভার দিয়াছিলেন। এই রামজীবন রায়চৌধুরী × এড়ালের বর্ত্তমান রায় চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। রায় চৌধুরী ইঁহাদের স্বোপার্জ্জিত উপাধি। রামজীবনের কর্ম্মকুশলতায় কি রাজা কি প্রজা সকলেই সমান সন্তুষ্ট ছিলেন।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে রাজসাহীর অবস্থা ক্রমেই হীন হইতে থাকে। এই হীনতা পরিবর্দ্ধনের জন্য দারুণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল ও প্রজাগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহের আশা বিনষ্ট করিয়া দিল। বীরভূম জেলার অধিবাসিগণ অন্নাভাবে কাতর হইয়া পড়িল। সহৃদয় রামজীবন এই অবস্থা অবলোকন করিয়া কর সংগ্রহে বিরত হইলেন ও যথাসাধ্য প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে লাগিলেন।

+ নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নামও রামজীবন। উভয়েই সমসাময়িক।

এই সময়ে উদয় নারায়ণ রাজসাহীর অধিপতি বা কর্ত্তা। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন ও কর সংগ্রহ অসম্ভব বলিয়া নবাবের নিকট যথারীতি আবেদন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা তখন শুনিবে কে ? নবাবের আদেশ—টাকা বাকী থাকিবেনা, যেপ্রকারে হউক কর সংগ্রহ করিতে হইবে। উদয়নারায়ণ তখন মহলে মহলে বেড়াইতে লাগিলেন ও প্রত্যেক আদায়-কারীর নিকট কর আদায়ের জন্য কঠোর আদেশ পাঠাইলেন এবং তাহাদের হিসাব নীকাশ তলব করিলেন।

রামজীবন এই আদেশ পাইয়া উদয় নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে হিসাব দেখিবার জন্য যাইতে হইবে বলিয়া অনুরোধ করিলেন। অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক বা নবাবের আদেশ স্মরণ করিয়াই হউক তিনি এড়ালে শুভাগমন করিলেন ও কিছু আদায় হইয়াছে দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রীতি ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া বিষাদে পরিণত হইল। তিনি বলিলেন—রামজীবন, কি করিয়াছে ? আমার এই অবস্থা, এসময়ে তুমি টাকা খরচ করিয়া নূতন সম্পত্তি খরিদ করিলে কেন ?

রামজীবন বিনয়সহকারে বলিলেন—আপনি একবার সম্পত্তি সকল স্বচক্ষে দর্শন করুন, যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, আপনি যে দণ্ড দিবেন আমি তাহাই অবনত৹

বদনে গ্রহণ করিব। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উদয় নারায়ণ রামজীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, রামজীবনও যাইবার সময় প্রজার দুরবস্থা দেখাইতে লাগিলেন ও সবিস্তার তাহা বলিতে লাগিলেন, পরিশেষে বলিলেন— আপনার টাকায় এই তারাদেবীর মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছি, চন্দ্রচূড় মহেশ্বরের পুনরুদ্ধার করিয়াছি এবং জীবিত কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করিয়া, পরিসর বাড়াইয়া, ইহাকে জীবিত করিয়াছি; কলেশ্বরের শিবালয় ও ঢেকার রামসাগর পুষ্করিণীও আপনার টাকায় হইয়াছে জানিবেন; এই সকল মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয় না করিলে আপনার দেশ যে আজ শ্মশানে পরিণত হইত! উদারহৃদয় উদয়নারায়ণ এই সকল দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে "রায় চৌধুরী" উপাধি দান করিয়া তদনুরূপ ভূসম্পত্তিও প্রদান করিলেন।

রামজীবন তারাদেবীর মন্দিরের সংস্কার করিয়া পূজার জন্য দেবল ব্রাহ্মণ বা পাণ্ডা নিযুক্ত করিলেন ও তাঁহাদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। তারাপুরের প্রধান পাণ্ডা শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেবশর্ম্মা এখনও সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। রামজীবনের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া এখানকার অধিবাসিগণ বা পাণ্ডাসকল সর্ব্বপ্রথমে এড়ালের প্রদত্ত বলি উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

এই সময়ে অর্থাৎ উদয় নারায়ণের পতন ঘটিলে

জেমোর রাজবংশ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিষ্ণু হইতে থাকেন। তারাপুরের জনৈক পাণ্ডা জেমোর রাজবাটীতে ভিক্ষার্থে গমন করিয়া পরিচয় দিবার সময় তারাপুরের পূজার কথা রাজা ও রাণীকে শুনাইয়াছিলেন। দয়াবতী রাণী তারা দেবীর পুষ্প গ্রহণ করিয়া বলিলেন—আমার পুত্র আছে, এইবার যদি একটি কন্যা হয় তাহা হইলে তারাদেবীর পূজা দিব। তারার কৃপায় রাণী সেবার কন্যা প্রসব করিলেন ও যাবজ্জীবন পূজার জন্য বলি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই পূজা এখনও চলিয়া আসিতেছে।

এই সৌভাগ্যশালিনী কন্যার নাম রাজেশ্বরী। রাজকুমারী রাজেশ্বরীর বিবাহ বাঘডাঙ্গা রাজবংশসম্ভূত স্বনামধন্য সূর্য্যমণি চৌধুরীর সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এই বিবাহের পর সূর্য্যমণির অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে বলিয়া তিনিও রাজেশ্বরীর কল্যাণের জন্য তারাদেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য এই পূজা আজিও যথারীতি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বীরভূমের তৎকালীন রাজধানী রাজনগর। তারাপুর এই সময়ে রাজনগরের অধীন হইয়াছিল। তথাকার রাজা তারাপূজার ভার শাহপুরের জমিদারের উপর অর্পণ করেন। চতুৰ্দ্দশীর দিবস তারাদেবীর যে পূজা হইয়া থাকে তাহার চতুর্থ বলি তদবধি শাহপুরের জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতেছে।

(৩)

রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের অধঃপতন ঘটিলে নাটোর রাজবংশ উন্নতি লাভ করিতে থাকে এবং রাজসাহীর যাবতীয় সম্পত্তিই ক্রমে ক্রমে নাটোর ভবনে গমন করিতে থাকে। এই কারণে বীরভূমের যে অংশ রাজসাহীর অন্তর্গত ছিল, তাহার কিয়দংশ নাটোরাধিপের করতলগত হইয়াছিল, অবশিষ্টাংশ তখন রাজনগরের অধীন।

রাণী ভবানী যখন নাটোরের কর্ত্রী, আসাদুল্লাখাঁ তখন রাজনগরের রাজা। তারাপুর খাঁসাহেবের অধীনে ও তাহার নিকটবর্ত্তী ভূভাগ রাণী ভবানীর শাসনে অবস্থিত, আসাদুল্লা খাঁ পূজার ব্যাপার নিজ রাজত্বে রাখিতে চাননা কিন্তু রাণী ভবানী তারাপূজার ভার লইবার জন্য সম্পূর্ণ ব্যস্ত। পরিশেষে রাণী দ্বারকা নদীর পরপারবর্ত্তী আটলা মৌজা খাঁ সাহেবকে দিয়া তারাপুর গ্রহণ করিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী তারা দেবীর পূজা রাজ সরকার হইতে চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি তাঁহার পূজা ও বলি চতুর্থ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থার সমুদয়ই তাঁহার বিধানানুযায়ী।

মলুটীর রাজবংশ অতিপ্রাচীন। বঙ্গদেশে ইহা অপেক্ষা গৌরবান্বিত কোন প্রাচীন বংশ নাই। কেহ কেহ বলেন ইঁহারা শুঙ্গবংশীয় নরপতি গণের গুরু ছিলেন। শুঙ্গ

বংশের অবনতি ঘটিলে ইঁহারা রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। দানে এই বংশের যশ নিতান্ত কম নয়। আজিও পূজার সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ মলুটী আসিয়া পুরুষানুক্রমে লব্ধ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মলুটীর রাজবংশ কখন অন্যের অধিকৃত ভূমিতে পদার্পণ করেনা —এই বাক্য বলিয়া মলুটীর বংশধর দেবেন্দ্র নাথ কখনও তারাপুর আসিতেন না, কিন্তু তিনি দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। এইরূপ শুনা যায় যে. তিনি জীবনের শেষদিবস পর্য্যন্ত তারাপুরকে নিজের অধিকারে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে কাটিগ্রাম, তারাপুর প্রভৃতি স্থান সকল তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল, এদিকে নদীর পরপারবর্ত্তী ভূভাগও তিনি অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু তারাপুর পারেন নাই। অবশেষে জীবনের শেষাবস্থায় তিনি নদীর অপরপারে নিজের অধিকৃত স্থানে পূজা দিবার আয়োজন করিলেন। ভক্তের বাঞ্ছাও পূর্ণ হইল। দেবী স্বয়ং বিরাম স্থান (বর্ত্তমান নাম বারামখানা) হইতে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দেবেন্দ্রের পূজা গ্রহণ করিলেন। মলুটীর পূজা তদবধি অপর পারেই হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন মলুটীর রাজগণ বিবাদে পরাস্ত হইয়া অপর পারে পূজা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য বা মিথ্যা তাহা বলা অসাধ্য।

তারাদেবীর বর্ত্তমান মন্দির মল্লারপুরের মহাজন স্বনাম ধন্য জগন্নাথ রায় কর্ত্তৃক ১২২৫সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি চাউলের ব্যবসা করিতেন বলিয়া "চেলো জগন্নাথ" নাম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেবীর একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। কোন মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়াতে তিনি এই মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রধান কৌলিক।

(১)

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এখানে দুই এক জন সাধু বাস করিয়া থাকেন। দিবারাত্র দেবীর ধ্যানে থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় অন্বেষণ করাই তাঁহাদের কার্য্য। সাধারণের অনুগ্রহ এবং তারাদেবীর পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ—এই সকল মহাত্মার একমাত্র জীবিকা। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

এই শ্রেণীর সাধুগণের মধ্যে আনন্দনাথের নাম সমধিক উল্লেখ যোগ্য। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাটোরের সহৃদয় রাজা রামকৃষ্ণ আনন্দ নাথের সহিত আলাপ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন।

আনন্দনাথ তন্ত্রশাস্ত্রের মত প্রচার করিবার জন্য তারা-

পুরকে কেন্দ্রস্থল করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং পূজার সময় যে সকল মহোদয় এখানে আগমন করেন তাঁহাদিগকে তিনি যত্নসহকারে পূজারক্রম, পুরশ্চরণ প্রভৃতি নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াসকল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল কারণে অল্পকাল মধ্যে তিনি সকলের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িলেন এবং তারাপীঠের প্রধান কৌলিকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই আনন্দনাথের সময় হইতে প্রধান কৌলিকের পদ চলিয়া আসিতেছে।

রাজা রামকৃষ্ণ এই সময়ে একবার তারাপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি আনন্দনাথের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া অধিকতর প্রীতি অনুভব করিলেন এবং নিয়ম করিয়া দিলেন—তারাদেবীর পূজার ব্যবস্থা ও তাহার পরিদর্শন প্রধান কৌলিকের কার্য্য; রাজসরকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন মাত্র; মন্দিরের তত্ত্বাবধান বা পূজা প্রধান কৌলিকের মতেই চলিবে।

আনন্দনাথ রাজার সুবিচার দেখিয়া প্রকৃতই আনন্দনাথ হইয়া পড়িলেন। তিনি এই ঘটনা চিরস্মরণের জন্য প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে তারাদেবীর বিশেষপূজার ব্যবস্থা করিলেন। এই পূজা আজিও প্রচলিত রহিয়াছে। আনন্দনাথ আর একটী নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা এই :—

তারাদেবীর মহাপূজার দিন যাবতীয় শাক্তগণ এখানে উপস্থিত হইবে ও দিবসত্রয় শাস্ত্রানুশীলনে রত থাকিয়া নিজ নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবে ও সাধারণকে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে পরিণত হয় নাই। কয়েকজন অনভিজ্ঞ অহঙ্কারী, তান্ত্রিকের মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মদ্যপানের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহার ফলে আজকাল যাঁহারা এখানে আসেন, তাঁহাদের অনেকেই অবৈধ মদ্যপানকে পূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ধর্ম্মব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

(২)

বঙ্গদেশের ইতিহাসে, বীরভূমের অধিবাসিগণ যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শাখা শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায় এখানে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং এখনও সেই প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। একান্ন মহাপীঠের মধ্যে পাঁচটী বীরভূম জেলায় বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠ যে কত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই জেলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করুন, অনাদিলিঙ্গ শিবের পূজা অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন; কালীপূজা বা দুর্গাপূজা হয় না এমন গ্রাম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দুধর্ম্মের অপর শাখা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গৌর নিতাই অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই নিত্যানন্দের জন্মস্থান তারাপুরের নিকটবর্ত্তী বীরচন্দ্রপুর গ্রামে। প্রত্যেক গ্রাম শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের লোকে পরিপূর্ণ হইলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা এখানে নিতান্ত কম নয়। এই জন্য এতদঞ্চলের লোকে আজিও বলিয়া থাকে—যে গ্রামে দোলদুর্গোৎসব নাই সে গ্রামে বাস করিতে নাই।

সাহিত্যও ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। সংস্কৃত সাহিত্যসেবক গীতগোবিন্দরচয়িতা বৈষ্ণববর জয়দেব এই জেলার অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গভাষার আদিকবি চণ্ডীদাসের নিবাসও এই ভূমিতে ছিল। এতদ্ব্যতীত এই স্থান যে কত কবির, কত গায়কের ও কত শিল্পীর জন্মস্থান তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব ও অসাধ্য।

কেবল ভাষা বা ধর্ম্ম লইয়া ইতিহাস হয় না, কোন খ্যাতনামা রাজা বা রাজনীতিবিশারদের বিবরণ আবশ্যক। বীরভূমে তাহারও অভাব নাই। সিরাজ-উদ্দৌলার সমসাময়িক আসাদুল্লা খাঁ ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে প্রধানকণ্টকসদৃশ নন্দকুমার ইতিহাসের সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

শাক্তগণের রীতির নাম বীরাচার। কেহ কেহ বলেন, বীরাচারগণের নিবাসভূমি বলিয়া এই জেলার নাম

বীরভূম হইয়াছে। তারাপুর এই প্রকার বীরাচারের কেন্দ্র স্থান। আনন্দনাথের নিয়মানুসরণ করিয়া সকলেই পূজার সময় তারাপুরে আসিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু ব্যবস্থার দোষে হিতে বিপরীত ঘটিল শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিবাদ বাধিয়া গেল। শাক্তগণ বীরচন্দ্রপুরের উৎসবে যাওয়া বন্ধ করিলেন, বৈষ্ণব দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে লাগিলেন এবং বৈষ্ণবেরাও সেইরূপ আরম্ভ করিয়াছিল। এই বিবাদের পরিণামে সাধুগণ তারাপুর বা বীরচন্দ্রপুর উভয় স্থান গমনে বিরত হইলেন। সুতরাং আনন্দনাথের উন্নতি অবনতিতে পরিণত হইবার উপক্রম করিল।

এই সময়ে আনন্দনাথ নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সদানন্দ ধামে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যাঁহারা প্রধান কৌলিকের পদ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহারা বিশেষ কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই।

যে সময়ে জগন্নাথ রায় মন্দিরের সংস্কার করেন তৎকালে এখানে আনন্দনাথ নামে একজন কৌলিক বাস করিতেন। অনেকে এই আনন্দনাথকে পূর্ব্বোক্ত আনন্দ নাথ বলিয়া থাকেন ও আবার কেহ কেহ তাঁহা-দিগকে একজন বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। ইহা কতদূর সত্য তাহা সাধারণের বিবেচ্য।

যাহাহউক এই আনন্দনাথের কীর্ত্তি বর্ণন করা আবশ্যক। ইনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না।

ইঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিলে ইঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা জন্মে। ইনি শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ বিনষ্ট করিবার জন্য, তারাদেবীর উৎসব জন্মাষ্টমীতে রথযাত্রায় ও দোলের সময়েও হইবে তাহার ব্যবস্থা করিলেন; এবং হরি ও হর যে একই তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রথম আনন্দনাথ যে বিবাদের বীজ বপন করিয়া বৃক্ষ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় আনন্দনাথ তাহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিলেন ও সর্ব্বত্র শান্তির প্রাধান্য স্থাপিত করিলেন। আবার সাধুগণ নির্ব্বিরোধে তারাপুর ও বীরচন্দ্রপুর যাতায়াত আরম্ভ করিল, আবার শাক্ত বৈষ্ণবের ও বৈষ্ণব শাক্তের সহচর হইয়া উঠিল।

বঙ্গীয় ১২৬১ সালে এই আনন্দনাথ দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার প্রধান ও প্রিয় শিষ্য মোক্ষদানন্দ প্রধান কৌলিকের পদ গ্রহণ করিলেন। তারাপুরের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত রাতমা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম মাণিকরাম, দীক্ষার পর মোক্ষদানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

ইনি বাল্যকালে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করিতেছিলেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই কুসংসর্গে পড়িয়া তিনি পাঠ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু জীবনের উন্নতি হইতে পারে এরূপ কোন উপায়

অবলম্বন করিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার দেবদেবীর পূজায় ভক্তি ছিল ও তিনি ভক্তিসহকারে যাবতীয় পূজাই দেখিতেন। এই ভক্তি বশতঃ তিনি ভবিষ্যতে উন্নতি পথের পথিক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সের পর তাঁহার মনে অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন—হায়! কি করিলাম! পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবদেবীর পূজা করিতেও শিখিলাম না? এই সকল ভাবিবার পর তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। মায়ার বন্ধন নন্দন বা নন্দিনী ছিল না; কেবলমাত্র পত্নী বিদ্যমান; তাঁহার অনুরোধ বা উপরোধ মাণিকরামকে গৃহবাসী করিতে পারিল না। মাণিকরাম গৃহত্যাগ করিলেন।

মাণিকরাম নানাদেশ নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া কাশীধামে থাকিবেন স্থির করিলেন ও কেহ নাই বলিয়া দণ্ডী হইলেন। দণ্ডীসমাজে অবস্থান করিয়া তিনি আবার সংস্কৃত সাহিত্য ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন এবং আবশ্যক মত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইঁহার নাম হইয়াছিল—মোক্ষদানন্দ।

একদিন মোক্ষদানন্দ কয়েকজন বঙ্গদেশীয় পুরুষ ও রমণীর নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পরিণীতা পত্নী তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। মোক্ষদানন্দ ভাবেন নাই যে ইঁহাদের সহিত তাঁহার পত্নীও আসিয়া-

ছেন এবং তাঁহার আত্মীয়েরাও রহিয়াছেন। দণ্ডিগণ পত্নী বিদ্যমান আছে অবগত হইয়া তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে দণ্ডিসমাজ হইতে দূর করিয়া দিলেন। তিনি তখন সপরিবারে বাণ-প্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ সংসারে আর ফিরিলেন না।

তাঁহারা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর ন্যায় কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তারাপুরে উপস্থিত হইলেন এবং দুই এক দিনের মধ্যেই আনন্দ নাথের প্রধান শিষ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন ও ক্রমে প্রধান কৌলিকের পদ অধিকার করিলেন।

মোক্ষদানন্দ স্থানীয় লোক। তিনি এই স্থানের রীতি, নীতি, শিক্ষা বা কার্য্য প্রণালী সমুদয়ই সুন্দররূপ জানেন এবং ইহাদের দোষ গুণও তাঁহার অবিদিত নাই। তাঁহার জীবনে এই সকল দোষ বা গুণের ফল ভোগও ঘটিয়াছে।

তিনি স্থানীয় লোকের চরিত্র বা শিক্ষা উন্নত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থির রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার মত এই যে, শাক্ত বা বৈষ্ণবের বালকগণ বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিবে ও আপন আপন গুরুজনের পূজার আয়োজন করিতে শিখিবে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে অর্থাৎ “বাবু গিরি” শিখিবে না ও মধ্যে মধ্যে গুরুজনের সহিত তারাপুর আসিবে।

বিবাহের পর দীক্ষিত হইবে এবং সপরিবারে দেব দেবীর পূজা যথাসাধ্য ও যথাবিধি সমাধা করিবে। পুত্র উপযুক্ত হইলে তাঁহার উপর গৃহভার অর্পণ করিয়া সপরিবারে তারাপুরে অবস্থান করিবে, নিতান্ত আবশ্যক হইলে কখন কখন গৃহেও যাইবেন। এই অবস্থায় পূজা করা ও অপরকে পূজা শিক্ষা দেওয়া তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইবে। শেষাবস্থায় তারাপুর পরিত্যাগ করিবেন না—কারণ "তারাপুরম্ ভুবি দুর্ল্লভম্।"

মোক্ষদানন্দের সময় জগদ্ধাত্রীপূজার দিনে বিশেষ পূজার বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চ পর্ব্বের পূজা আনন্দনাথের সময় হইতে চলিতেছে। তবে যেরূপ শুনা যায় তাহা হইতে আমাদের এই বোধ হয় যে, দুর্গোৎসব, রটন্তী ও বাসন্তী উপলক্ষে পূজা এবং পঞ্চ পর্ব্বের পূজা রামজীবনের সময় প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

মোক্ষদানন্দের দেহত্যাগ ঘটিলে বামাচরণ প্রধান কৌলিকের পদ অধিকার করিলেন। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাঁহার বিষয় বর্ণিত হইল।





শ্রীশ্রীবামা ক্ষেপা



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাগলের পরিচয়।

পরপৃষ্ঠায় যাঁহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, তিনি "বামা ক্ষেপা" বলিয়া বিখ্যাত। তারাপুরের নিকটবর্ত্তী অটলা নামক গ্রামে ১২৪১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সর্ব্বানন্দ পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন; সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া সকল তিনি ভক্তির সহিত সম্পন্ন করিতেন।

সর্ব্বানন্দের সন্তান চারিটী; দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। বামাচরণ জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, কনিষ্ঠের নাম রামচন্দ্র।

বামাচরণ বাল্যকালে পড়া শুনায় মন না দিয়া অধিকাংশ সময় খেলায় অতিবাহিত করিতেন। খেলিবার সময় তিনি দেব দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতেন। কালীপূজার সময় বামাচরণ কালী গড়িয়াছেন, কচুপাতার নৈবেদ্য দিয়া তাহার পূজা হইল। কালী প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া তিনি জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করিলেন। জগদ্ধাত্রীর পর রাসমঞ্চ নির্ম্মিত হইল—এইরূপে তিনি সমবয়স্ক বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া যাবতীয় পূজাই

সম্পন্ন করিতেন। পিতা এই সকল পূজার ঘটা দেখিয়া পুত্রকে উৎসাহ দিতেন। সুতরাং বামাচরণের বাল্যকাল অতি সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

বামাচরণের বাল্যকাল অতীত হইতে না হইতেই সর্ব্বানন্দ প্রাণত্যাগ করিলেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র তখন নিতান্ত শিশু। বামাচরণ যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখেন নাই, তাঁহার সম্পত্তিও তেমন নাই যে স্বচ্ছন্দে দিনপাত ঘটিতে পারে; সুতরাং বামাচরণ সংসারের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

আমরা এইরূপ শুনিতে পাই যে বামাচরণ যখন সংসারের ভাবনায় কাতর হইয়া পড়িতেন, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তারা দেবীর নিকট আসিতেন। ভবভয় বিনাশিনীর সম্মুখে আসিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইয়া বলিতেন মা তারা! আমাদের কষ্টের কি শেষ হইবে না? বামাচরণ এই কথা বলিয়াই একটী প্রণাম করিতেন ও বাটীর দিকে ছুটিতেন।

এই ভাবে দুই বৎসর অতীত হইলে, একদিন মা বলিলেন বামাচরণ একটা কাজ কর্ম্মের সন্ধান কর তোর বিয়েয় সময় হ'ল, পাগলামিটা একটু ছাড়। বলা বাহুল্য বামাচরণ তখন পাগল উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বামাচরণ ভাবিতেছেন, মা বলিয়াছেন --কাজকর; যদি কাজই করিতে হয় তবে প্রকৃত কাজ করিব; বৃথা কাজে

আর সময় নষ্ট করিব না। এই সকল চিন্তার পর, পরদিন প্রাতঃকালে বামাচরণ বলিলেন মা, তবে আমি কাজ করিতে যাই। জননী যখন উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন তিনি ভাবেন নাই যে বামা তাঁহার এককথায় সুশীল ও সুবোধ বালক হইবে এবং সত্যসত্যই বামার মতি গতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সেদিন তিনি বালকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন বামা আর সে বামা নহে। জননী তখন মুখচুম্বন করিয়া সস্নেহ সম্ভাষণসহকারে বলিলেন বামা তুই আমার পাগল সন্তান, তুই কোন দিন লেখাপড়া করিস্ নাই, তুই কি কাজ করবি বাপ? মাকে কাঁদাইয়া আর কোথাও যাইতে হইবে না, তুই আমার পাগল সন্তান, ঘরে থাক্ চাষের যত্নকর; না হয় গোমস্তার কাছে থাকিয়া কাগজ লিখিতে শিক্ষাকর, তারপর যা মনে হয় করিস্।

স্বর্গীয় লালাবাবু ধীবর পত্নীর মুখে শুনিয়াছিলেন "সন্ধ্যা হ'ল, কখনই বা পার হ'ব!" এইকথা শুনিয়া লালাবাবু বুঝিলেন—ধীবরপত্নী তাঁহাকে জীবন সন্ধ্যার কথা বলিতেছেন, ভবসাগর পার হইবার বিষয় ভাবিতে বলিয়াছেন। তাই তিনিও তৎক্ষণাৎ উদাসীন হইলেন এবং সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। বামাচরণ ভাবিতেছেন মা কাজ করিতে বলিয়াছেন, অতএব আমি কাজ করিব; তবে যাহা প্রকৃত কাজ তাহাই করিতে হইবে।

মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বামা কি ভাবিতেছিস্? বৃথা ভাবনায় কাজ কি? এবার বামাচরণ উত্তর দিলেন, বলিলেন—মা আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কোথাও ঠাকুর পূজা করিব, তাহা ত আমি পারিব? ইহাতে আমি যাহা পাইব তাহাই যথেষ্ট হইবে নাকি?

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল বামাচরণ মলুটী যাইবেন ও সেখানে কাহারও বাটীতে দেবপূজায় নিযুক্ত হইবেন।

বামাচরণ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে মলুটীতে গমন করিয়াছিলেন ও পুষ্প চয়ন করিয়া পূজার আয়োজন করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন সে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই। একদিন তিনি প্রভুকে বলিলেন, মহাশয় বামাচরণ ভক্তিহীন পূজার আয়োজন করিতে পারিবে না, আপনি তাহাকে বিদায় দিন্। মলুটীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বামাচরণ কয়েকদিন হরিষাড়া গ্রামে ভগিনীর বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার মন সম্পূর্ণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কেন এরূপ ঘটিল বলা অসাধ্য।

হরিষাড়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি কয়েক মাস যেখানে সেখানে ভ্রমণ করেন এবং অবশেষে তারাপুরেই থাকিবেন স্থির করিলেন। এই সময়ে মোক্ষদানন্দ প্রধান কৌলিকের পদে সমাসীন।

তিনি বামাচরণের ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। মোক্ষদানন্দ পরলোক গমন করিলে বামাচরণ কৌলিকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার বয়স অল্প, সাংসারিক কার্য্য পরিচালনায় অনভিজ্ঞ এবং শাস্ত্রেও অধিকার নাই সুতরাং পূজার তত্ত্বাবধান আবার কর্ম্মচারিগণের হস্তে অর্পিত হইল।

বামাচরণ এখন নিশ্চিন্ত হইলেন, তাঁহার এক মাত্র কাজ তারাদেবীর আরাধনা। "তারা, তারা" বলিয়া তিনি সর্ব্বদা চীৎকার করেন। আমাদের বোধ হয়, তিনি তারা নাম জপ করিয়া দেবীর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন।

বামাচরণের বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। মৃতদেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য তারাপুরে আনীত হইয়াছিল। এই প্রদেশের লোকে তারাপুরে মৃতদেহ ভস্মীভূত করিয়া থাকে। কিন্তু সেদিন নদীতে বন্যা অতি প্রবল। এই বন্যার জন্যই বামাচরণ মাতার পীড়ার সংবাদ জানিতে পারেন নাই। লোকে যখন হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার মাতার মৃতদেহ লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল, বামাচরণ তখন স্নান করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন ও মা মা বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। ধন্য মাতৃশোক! যোগীই হউন আর জিতেন্দ্রিয়ই হউন তিনি মাতৃবিয়োগে কাতর না হইয়া

থাকিতে পারিবেন না—'অতল অপার মাতৃস্নেহ পারাবার।"

অপরপারে থাকিয়া কেহ কেহ বামাচরণকে সান্ত্বনা দিতেছেন, আর কেহ কেহ শবদেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য চিতা প্রস্তুত করিতেছেন। বামাচরণ দেখিলেন বন্যা অতি প্রবল, পার হইবার আশা নাই, নদীর পরিসর যদিও অধিক নহে স্রোত কিন্তু অতি প্রখর; এত প্রখর যে নৌকা লইয়া যাওয়াও অসম্ভব। সেখানে বড় বড় নৌকা ছিল না, থাকিলে বোধ হয় তাহা লইয়া পার হওয়াও অসম্ভব হইত। বামাচরণ বলিলেন "তারা মা তারা আমার মা কি তোর তীরে স্থান পাইবে না?" এই বলিয়াই তিনি সেই খরস্রোতে দেহ-তরি ভাসাইয়া দিলেন।

উভয় তীর ইতিমধ্যে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে. কেহ বলিতেছেন পাগ্‌লা আজ আর বাঁচিবে না। কেহ বলিতেছেন আজ আর নিস্তার নাই। কেহ দেখাইতেছেন ঐ দেখ্ বামা জন্মের মত ডুবিল। প্রবল বন্যা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। সে সমানভাবে সাগরের দিকে ছুটিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বামাচরণ তারা তারা বলিতে বলিতে অপর পারে উপস্থিত হইলেন এবং মাতৃদেহ পৃষ্ঠে বাঁধিয়া আবার সেই স্রোতের সম্মুখীন হইলেন। লোকে কত নিষেধ করিল, কত কথা বলিল

কিন্তু বামাচরণ তাহার কিছুই শুনিলেন না ; কেবল মাত্র বলিলেন "আমার মার সৎকার এ তীরে হইবে না, যথাস্থানেই হইবে।"

মাতৃভক্তের নিকট এরূপ ব্যাপার বিশেষ কঠিন নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও একদিন মাতৃচরণ দর্শনের জন্য দামোদরের প্রবল বন্যা সন্তরণে পার হইয়াছিলেন। মাতৃভক্তের—বিশেষতঃ মহাপুরুষের—নিকট অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে! সুতরাং তারাদাস বামার নিকট অসাধ্য কি সুসাধ্য হইতে পারে না ?

বামাচরণের মাতৃদেহের সৎকার মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইল। এরূপ কয়জন জননীর অদৃষ্টে ঘটে ? এই জন্যই বোধ হয় লোকে সুপুত্র লাভের জন্য এত লালায়িত হয়! এই ঘটনাটীর ব্যাখ্যা লোকে অন্যভাবে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—বামাচরণ তারানামের দোহাই দিয়া সেদিন নদী হাঁটিয়াই পার হইয়াছিলেন। মহাপুরুষের কার্য্যে অসম্ভবও সম্ভবপর হয়, সুতরাং ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা কে বলিতে পারে ?

মাতৃশ্রাদ্ধের দিবসেও বৃষ্টির বিরাম নাই। সেদিন অবিরত মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতেছে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কোনরূপে সম্পন্ন হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজন বুঝি আর হয় না! গৃহমধ্যে স্থানের অভাব। প্রাঙ্গণ ব্যতীত

ব্রাহ্মণগণকে বসিতে বলিবার স্থান আর নাই। সেই প্রাঙ্গণ ভূমি আবার জলময়! ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে ক্রমেই সমাগত হইতেছেন। তাঁহারা সকলেই বামাচরণকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন, জননীর সৎকারের সংবাদ শুনিয়া ভক্তির পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে, সুতরাং সকলেই সেদিন বামাচরণের বাটী আসিবার জন্য ব্যস্ত। তাই প্রবল বর্ষায় ভিজিতে ভিজিতেও দ্বিজগণ সমাগত হইতেছেন!

ব্রাহ্মণগণ একে একে উপস্থিত হইতেছেন আর বামাচরণের ভয়ও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। বামাচরণ ভাবিতেছেন, ইঁহাদের বসিবার স্থান দিতেও আজ অসমর্থ; তখন তিনি আকাশের ভাব দেখিয়া, হতাশপ্রাণে আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন তারা তুই কি বিঘ্নবিনাশে অসমর্থ হইয়াছিস্? অথবা তুই পাষাণ বাপের মান রাখিবার জন্য পাষাণী হইয়াছিস্? তারা আমার বিপদ কি বিনষ্ট হইবে না?

আমাদের বোধ হয়, তাঁহার কাতর কণ্ঠের কথা করুণাময়ীর কর্ণে সেদিন প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার কারণ—সহসা আকাশ তখনই পরিষ্কার হইয়াছিল এবং আকাশের তৎকালীন ভাব দেখিয়া সমবেত জনগণ অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন। দেবীর কৃপায় সেদিন ব্রাহ্মণ ভোজনে আর কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

ক্রিয়াদিও সমাপ্ত হইল বামাচরণও তারাপুরে উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া তারা নাম জপ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ যে আসনে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এই আসন সেই স্থানেই নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিকটে একটী প্রকাণ্ড শিমুল গাছ ছিল। বহুকালের পর তাহা অদ্য কয়েক বৎসর হইল বিনষ্ট হইয়াছে। লোকে বলে, এই আসনে প্রকৃত সাধু না হইলে বসিতে বা বসিয়া থাকিতে পারিবে না, যদি কেহ বসে তাহা হইলে সে ভয় পাইয়া থাকে। ফলতঃ স্থানটী যেরূপ মনোরম ও শান্তি রসাস্পদ তাহাতে আসন দর্শন করিবা মাত্রই দর্শকের মনে ভক্তিরসের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে স্থানটীর বর্ত্তমান দৃশ্য চিত্রে অবলোকন করুন ঃ—



আধুনিক মহাপুরুষগণের মধ্যে রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ ও মোক্ষদানন্দ এই আসনে বসিয়াছিলেন। এক্ষণে বামাচরণ ভিন্ন এখানে বসিবার উপযুক্ত পাত্র এতদঞ্চলে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পৃথিবীর পৃষ্ঠ সকল স্থলে সমান নয়, সকল লোকের জ্ঞান বা ধারণাও সমান নয়; সকলের প্রকৃতিও সেইজন্য একরূপ দৃষ্ট হয় না। বামাচরণের যশোরাশি যখন দিগন্তে বিস্তৃত হইতে থাকে, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিবার জন্য শত শত লোকে যখন তারাপুর আগমন করিতে থাকে, তখন কয়েকজন দুষ্ট কু-আশার বশবর্ত্তী হইয়া কোয়াসার ন্যায় এই সূর্য্য সদৃশ তেজস্বীর তেজোরাশি ম্লান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা বলিত—বামাচরণ ভণ্ড, চরিত্রহীন প্রভৃতি, এবং তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তৎকালীন রাজকর্ম্মচারী বামাচরণের প্রসাদ পাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং বামাচরণ কয়েকদিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইলেন।

পরীক্ষা সকল প্রকার সুখ্যাতির মূল। অগ্নির উত্তাপে স্বর্ণ যতবার পরীক্ষিত হয়, তাহার কলঙ্ক, যদি থাকে, ততবারই কিছুকিছু করিয়া কমিয়া যায় ও তাহার উজ্জ্বলতা ততই বাড়িতে থাকে। আমাদের বোধ হয়, বামাচরণের পরীক্ষার সময় উপস্থিত। যাহাই হউক না কেন বামাচরণের তাহাতে লক্ষ্য নাই। কয়েকদিন যে তিনি

অনাহারে আছেন, তাহাতেও তাঁহার ক্লেশ নাই। তিনি "তারা তারা" বলিয়া যাবতীয় যাতনা বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্লেশ কি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে? যে একবার অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে, সামান্য ক্ষুধা তৃষ্ণা কি তাহাকে কাতর করিতে পারে?

যে সকল কর্ম্মচারীর উপর তারাপূজার ভার অর্পিত থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর, সুতরাং রীতিমত পরিদর্শনের অভাবে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যে সময় বামাচরণ উপবাসী, তখন যিনি প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহার অবিবেচনায় নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিয়াছিল। এখনও মধ্যে মধ্যে এই প্রকারের নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

বামাচরণ আজ চারিদিন উপবাসী—এই কথা তখন সকলেই বলিতে লাগিল ও ভাল মন্দ বিচার করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, কলিতে সাধুর কষ্ট সুতরাং বামাচরণের কষ্ট হইবে না কেন? কেহ কেহ বলিল ভণ্ডের ভণ্ডামি বেশীদিন থাকে না। এমন সময়ে নাটোরের প্রধান কর্ম্মচারী তারাপুরে উপনীত হইলেন। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। তিনি দেখিলেন দেবীর পূজা সেদিন শেষ হইয়াছে, তথাপি তিনি পূজকগণকে আবার পূজা করিতে বলিলেন ও নানা উপহারে

দেবীর পূজা দিয়া বামাচরণকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন এবং সর্ব্বশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বয়ং আহার করিলেন। তারাপুরের কর্ম্মচারিগণ বামার পূজা দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করিল না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় তিনি সমুদয় কর্ম্মচারিগণকে সমবেত করিয়া বলিলেন—আমি দুইদিন পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলাম, তারাদেবী বলিতেছেন কাল হইতে আমার পূজা হয় নাই, আমি উপবাসী আছি। এই কথা শুনিয়াই ভয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং আমিও তৎক্ষণাৎ তারাপুর আসিবার উদ্যোগ করিলাম। পথে দুইদিন বিলম্ব হইল কিন্তু কি করিব উপায় নাই, আমিও এই দুইদিন উপবাসী আছি। মল্লারপুরে উপনীত হইয়া আমি যাহাকে দেখিতে পাই, তাহাকেই তারাপূজা হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে সকলেই বলে পূজা যথারীতি হইতেছে। অবশেষে আমি যখন তারাপুরে প্রবেশ করি, তখন শুনিতে পাইলাম যে বামাচরণ আজ চারিদিন উপবাসী আছেন, তাঁহাকে আর পূজার পর প্রসাদ দেওয়া হয় না। আমার মনে হইল এইজন্য তারাও উপবাসী রহিয়াছেন। তোমরা সাবধান হও বামাচরণকে আর উপবাসী রাখিও না।

এই ঘটনার পর, আর কেহ বামাচরণের বিরুদ্ধে কিছু

বলিতে সাহসী হয় নাই। তিনিও তদবধি মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এক্ষণে তাঁহার জাতি বিচার নাই, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই। তিনি খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় যদি কোন অস্পৃশ্য কুকুর আসিয়া তাহাতে মুখ দিয়াছে দেখেন তথাপি তাঁহার মনে ঘৃণার উদয় হইবে না। তাঁহার নিকট শৃগাল ও কুকুর একত্রে মিত্রভাবে বাস করে। তিনি অবিরত মদ্যপান করিয়াও মত্ত হন না, কিম্বা কোন দিন মদ্য না পাইলে তাহার জন্য ক্লেশানুভবও করেন না। তিনি নশ্বর কলেবর ধারণ করেন সত্য, কিন্তু সেই দেহস্থিত কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত নহেন—তিনি মানব অথচ দেবতা।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে তিনি অর্থসঞ্চয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন ও তজ্জন্য দুইটি লোহার সিন্দুক রাখিয়াছিলেন. কেহ কোন প্রণামী দিলে তিনি তাহা তদ্দণ্ডে ঐ সিন্দুকের মধ্যে রাখিতেন। নিন্দকেরা এই সুযোগে কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু পূর্ব্বের ঘটনা মনে করিয়া বলি বলি করিয়াও কিছু বলিতে পারে নাই। ঐ সঞ্চিত অর্থ তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র লইয়া যাইতেন ও গৃহ কর্ম্মে ব্যয় করিতেন। দুই চারি বৎসরের মধ্যেই রামচন্দ্রের অবস্থা উন্নত হইল। অদ্য দুই বৎসর হইল রামচন্দ্র ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং

বামাচরণও অর্থসংগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বামাচরণের বৃদ্ধাবস্থায় অর্থের আকাঙ্ক্ষা বলবতী দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল—হয় ত ইনি যোগভ্রষ্ট হইতেছেন। কিন্তু এক্ষণে আমাদের সে ধারণা দূর হইয়াছে। বামাচরণ বাল্যকালে বলিয়াছিলেন তারা,মা তারা, আমাদের ক্লেশ কি দূর হইবেনা? আমাদের বোধহয়—তারা সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য এইপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আজ কাল লোকের বিশ্বাস এইরূপ হইয়াছে যে সাধু পুরুষ যদি ভোজবাজীর মত বা যাদুকরের ন্যায় নানা প্রকার অলৌকিক কাণ্ড দেখাইতে না পারেন, তবে তিনি কখনই সাধু নহেন; যিনি সাধু হইবেন, এবং নানা প্রকার ঔষধ দিবেন, শাস্ত্রের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিবেন ও নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারিবেন—তিনিই সাধু। বামাচরণের শাস্ত্রে জ্ঞান নাই,. তিনি প্রাণায়াম করিতে করিতে শূন্যে উঠিতে পারেন না, কাহাকেও ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বলিতে পারেন না—তবে তিনি কি প্রকার সাধু? যাঁহারা এই শ্রেণীর সাধু দেখিতে চান তাঁহারা, আমাদের অনুরোধ, বামাচরণের নিকট যাইবেন না—কারণ তিনি এই সকল দেখাইতে ভাল বাসেন না।

তবে তিনি কখন কখন কোন কোন লোকের ব্যাধি

বিনাশ করিয়াছেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট এই অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে ভক্তি আবশ্যক, হৃদয়ে পবিত্রতার প্রয়োজন, বৃথা আস্ফালনের কর্ম্ম নয়। যাঁহারা বামাচরণের নিকট অসীম দয়া লাভ করিয়াছেন তাঁহারা কাহারও নিকট পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না, সুতরাং আমরা এখানে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিতে পারিলাম না।

দেবপ্রতিম বামাচরণ এখনও বর্ত্তমান। তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া জীবন পবিত্র করা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমরা লোকমুখে যে সকল কথা শুনিতে পাই নিম্নে তাহাদের কয়েকটী লিখিয়া তাঁহার পুণ্যকাহিনী অশেষ হইলেও শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।

(১) একদা একজন ভদ্রলোক বামাচরণকে মদে মত্ত করিবার জন্য তাঁহাকে তিন দিন অবিরত মদ্যপান করাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এবং পরিশেষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন।

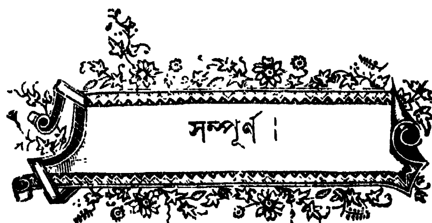
(২) এক জন মাংস বলিয়া মহামাংস অর্থাৎ মৃত-দেহের গলিত দগ্ধমাংস খাওয়াইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহা-তেও বামাচরণের মনে ঘৃণা জন্মে নাই বা তাঁহার কোন অসুখ হয় নাই।

(৩) একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বামাচরণকে অর্থসংগ্রহ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে কয়েকখানি অলঙ্কার

দান করিয়া ছিলেন। বামাচরণ বলিয়াছিলেন -অস্থি-মালা আমার অলঙ্কার, ইহার প্রয়োজন নাই—বলিয়া সেই সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

(৪) বামাচরণ কাহাকেও কোন কথা বলিবার সময় বলিতেন এবং এখনও কখন কখন বলেন—শালা চোর। এইকথা শুনিয়া একজন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া ছিলেন---কে বলে বামা পাগলা, বামা চোর বামা ভণ্ড, যে চোর সেই সকলকে চোর বলিয়া থাকে। বামাচরণ উত্তরে বলিয়া ছিলেন -সাধু কি কখন চোরের কথায় রাগ করেন ?

(৫) একবার একটী মোকদ্দমায় বামাচরণ সাক্ষী বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বাদী ও প্রতিবাদী বামাচরণকে আদালতে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিল। বামাচরণ বলিয়াছিলেন---আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে না তোমরা দুই জনেই দণ্ডিত হইবে। যথাকালে আদালতের বিচারেও তাহাই ঘটিয়াছিল।



ভাষা-সোপান।

প্রথম ভাগ—মূল্য দশ আনা।

শ্রীযুক্ত রামরূপ বিদ্যাবাগীশ, হেড্‌পণ্ডিত, হেয়ারস্কুল ও শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সহকারিশিক্ষক, হেয়ারস্কুল কর্ত্তৃক প্রণীত।

বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অর্থাৎ প্রবন্ধ রচনা বা চিঠিপত্র লিখিতে কিম্বা কোন বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, যে সকল কৌশল অবলম্বন করা উচিত ও আবশ্যক তৎসমুদয় এই পুস্তকে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক আর নাই বলিলেই চলে।

ম্যাট্রিকুলেসন্, আই, এস্, সি, আই. এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার প্রশ্নপত্রে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন প্রদত্ত হয় বা হইতে পারে, ইহাতে তৎসমস্তই আলোচিত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি সাধারণেরও পাঠ করা উচিত, কারণ বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান লাভ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা কিছুদূর পড়িয়া পাঠ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে অপরের সাহায্য না লইয়াও গল্প, ছোট ছোট কবিতা প্রভৃতি সহজেই লিখিতে পারিবেন।

এই পুস্তকের সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের অত্যুজ্জ্বল রত্ন সকল কি লিখিয়াছেন দেখুন :—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"Bhasha-Sopan by Pandit Ramrup Vidyabagis and Mahima Ranjan Mukhopadhyay will, I am sure, prove very useful to students who want to acquire a critical knowledge in Bengali Composition."

(Sd) SATISH CHANDRA VIDYABHUSAN
Principal.

প্রেসিডেন্সি কলেজের লেক্‌চারার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

I have gone through the Book Bhasha-Sopan and have much pleasure to say that the book will be of immense use to the students who want to learn Bengali Composition.

(Sd) HARIHAR BANERJE M. A.
Lecturer, Presidency College.

কটক কলেজের সিনিয়র সংস্কৃত প্রফেসর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন এম্, আর, এ, এস্. মহোদয় লিখিয়াছেন :—

I have gone through Bhasha-Sopan by Sj Ramrup Vidyabagis and Sj Mahima Ranjan Mukherjee, and am very glad to say that the

book is entirely a new book in the field. It is made on a new plan and will, I hope, be of great use to the boys in Bengali Composition preparing for the Matriculation Examination.

(Sd) KRISHNAPADA VIDYARATNA M. R. A. S.
Senior Sanskrit Professor, Cuttack College.

হিন্দুস্কুলের সুবিখ্যাত হেড্মাষ্টার রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র এম, এ, বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

Bhasha-Sopan Part I by Pandit Ramrup Vidyabagis and Mahima Ranjan Mukhopadhyaya is prepared on quite a new plan to help students preparing for the Matriculation Examination in Bengali Composition. All the aspects, from which questions might come, have been carefully dealt with. In my opinion, the book will be of great use to those for whom it is intended.

(Sd) RASAMAY MITTER,
Head Master, Hindu-School.

শ্রীভুবন মোহন মিত্র।
গিরিশ-লাইব্রেরী।
২১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মহিমা প্রচার কার্য্যালয়

যে সকল পুণ্যকাহিনী বিস্মৃতির করাল কবলে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহাদের কতকগুলিকে, কিছু দিনের জন্য স্মৃতির মন্দিরে রক্ষা করা এই কার্য্যালয়ের উদ্দেশ্য। আমাদের এই কার্য্যালয় সন ১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তদবধি যথাশক্তি কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছে।

যাঁহারা এই কার্য্যালয়ের সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর কোন একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবেন, অথবা এরূপ উপকরণ পাঠাইবেন যাহাতে একটী প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। হিন্দুকুলগৌরব সহৃদয় জমিদারগণ এই শ্রেণীর পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে যেরূপ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাতে আমাদের মনে হয় যে কেবল মাত্র আমাদিগের চেষ্টার অভাববশতঃ এই সকল পুণ্যকাহিনী বিস্মৃতির অতল তলে চিরকালের জন্য নিমগ্ন হইতেছে। ইহাদের উদ্ধারে যত্ন করা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এই বিষয়ে কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে, আমার নামে পত্রাদি পাঠাইবেন। উত্তর যথাসাধ্য প্রেরিত হইবে।

বাজিতপুর
পোঃ—কুণ্ডলা
জেলা—বীরভূম

বিনয়াবনত
শ্রীস্মরণানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

